অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 10 - 2022

ভারতীয় সমাজ ও প্রান্তজন

ডঃ রজত কিশোর দে
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সুব্রত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol.10 originally published online November 2022

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2022 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol. 10: 2022 | **ISSN 2347-8055**

ভারতীয় সমাজ ও প্রান্তজন

ডঃ রজত কিশোর দে, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ও

সুব্রত মণ্ডল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

ভারতবর্ষ বিবিধের মাঝে মহান মিলনের দেশ। বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ভারতের মূল সুর। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে ভালোবাসা ও মানবতার বাণী প্রচার করে চলেছে। ভারতের মহান চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ মানব প্রেমের পথে বর্ণ- জাতের বিভাজন দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় সমাজ অসংখ্য জাতি- উপজাতি, দল-উপদলে বিভক্ত। আর্যের সময় থেকে সমাজের শূদ্র, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য মানুষেরা সমাজের প্রান্তে বাস করতে বাধ্য হত। ক্ষমতার অধিকারী ব্রাহ্মণ এদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বেচে থাকার প্রায় সমস্ত সুযোগ সুবিধা। মানুষ হয়েও মানুষের সম্মান না পেয়ে নির্বাক, প্রতিবাদহীন জীবন কাটিয়েছে দিনের পর দিন। প্রাচীন ভারতে বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে বিভাজনের সাথে ঔপনিবেশিক যুগে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক বিভাজন। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের নতুন সমীকরণ তৈরি হয় ভারতবর্ষে। আধুনিক সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাবে শোষিত, নিপীড়িত ,বঞ্চিত মানুষকে নতুন ধারণায় ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বিশ শতকের শেষ তিন চার দশকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রান্তজন বিষয়ক আলোচনা গতি পেয়েছে। কারা প্রান্তজন ? কিভাবে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত নিপীড়িত শোষিত মানুষ যারা সভ্যতার মূলকেন্দ্র থেকে প্রান্তে অবস্থান করে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে কেন্দ্রের দিকে যাবার তাদেরকে প্রান্তজন রূপে চিহ্নিত করা হয়। প্রান্তজনের ধারণা আপেক্ষিক একটি ধারণা। সময়ের অগ্রগমনের সাথে জাতিগত প্রান্তজনের পাশাপাশি জীবিকা, অবস্থান, সাংস্কৃতিক মানের পার্থক্যে প্রান্তজনের বিচার বিশ্লেষণ হয়ে চলেছে। শূদ্র, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, চণ্ডাল, ডোম, কাহার, কাপালি, দাস দস্যু যারা বিভিন্ন কারণে সমাজের প্রান্তেবাস করে অথবা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থান করেও সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত, শোষিত পীড়িত তারা প্রান্তজন। এছাড়া ভবঘুরে, পাগল, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, লাঞ্ছিত নারী প্রান্তজন রূপে বিবেচিত হন। আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজ প্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে আধুনিক ভারতবর্ষে প্রান্তজনের বিচার বিশ্লেষণ করা হবে।

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞানে প্রান্তজন বা Marginal Man তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বে Marginal Man বা প্রান্তিক মানবের ধারণা গবেষণার ব্যাপক পরিসর সৃষ্টি করেছে। দুই ভিন্ন সংস্কৃতিক বাস্তবতার মধ্যে আটকে পড়া মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত সংগ্রামশীল সত্তা বোঝানোর জন্য প্রান্তিক মানব সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেন রবার্ট এজরা পার্ক (1864 - 1944) এবং এভার্ট এস্তোনেকুইস্ট (1901 - 1979) । রবার্ট এজরা

পার্ক ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'American Journal of sociology' পত্রিকায় 'human migration and marginal man' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখার সাঁইত্রিশ বছর পরে 1965 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে Ruth Johnston লেখেন 'The concept of the Marginal Man' প্রবন্ধ। প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> "In the present context marginality is understood in terms of a cultural conflict experienced by people living in to different culture milieus. The two cultures in question are usually arranged in hierarchy. One of the carries power and prestige and is usually referred to us the dominant culture. The other is evaluated as being inferior to the first. "[১]

'প্রান্ত' এবং 'জন' সহাবস্থানে গঠিত প্রান্তজন। 'প্রান্ত' শব্দের অভিধানিক অর্থ—

সং (প্র + অন্ত) বি প্রাদি, অর্থাৎ শেষসীমা, কিনারা, ধার, অবধি।[২]

'জন' শব্দের আভিধানিক অর্থ — সং (√ জন্ + অ) বি—

১) মানুষ, লোক [জনবহুল; জন সম্পদ]

২) সাধারণ মানুষ, সর্বসাধারণ

৩) গণ, সমূহ [গোষ্ঠী-জন-বল্লভ]

৪) দিন-মজুর, শ্রমিক, দৈনিক মজুরিতে কাজকরে এমন লোক।[৩]

প্রান্ত + জন শব্দ দুটি একত্রে 'প্রান্তজন'-এর অর্থ দাঁড়ায় শেষ সীমা বা কিনারায় অবস্থিত সাধারণ মানুষ।

প্রান্ত শব্দটির পরিভাষা Margin বা Marginal, margin -এর অর্থ কিনারা, প্রান্ত, কানা (পার) উপান্ত, পর্যন্ত। Marginal এর অর্থ প্রান্তীয়।

প্রান্তীয় শব্দটি- প্রান্তিক, প্রান্তবর্গীয়, প্রান্তদেশীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সংখ্যাতত্ত্ব, অঙ্ক, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সমাজ বিজ্ঞানের সাথে গভীর সম্পর্ক যুক্ত Marginal Man শব্দের অভিধানগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ গ্রহণ করে প্রান্তজনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

> মানুষের সমাজে সর্বশক্তিমান অদৃশ্য মূলস্রোতের বাইরে বা সীমানায় অবস্থান করা সেইসব মানুষ যারা সর্বদা প্রভুত্ব - অধীনতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে মানসিকভাবে প্রান্তবর্তী হয়ে বেঁচে থাকে তারাই প্রান্তজন। সমাজের মূলস্রোতের সাথে মিশে যাবার সুযোগ প্রান্তজনের হয় না। কারণ 'ক্ষমতা বন্টনের বিষমতায়'[৪] প্রান্তজনের সৃষ্টি। প্রান্তজন সমাজের মূলস্রোতের অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর 'আধিপত্যবাদের শিকার।'[৫]
>
> প্রান্তের ধারণা সমাজ আরোপিত একটি আধিপত্য বিস্তারী বিমূর্ত ধারণা। যে ধারণার সাথে সুনির্দিষ্ট অঞ্চল পরিধির সম্পর্ক ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ 'ক্ষমতা-আধিপত্য, বৃত্তের সঙ্গে প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতির মূলস্রোতের বাইরে প্রান্তের ধারণাগত অবস্থান।'[৬]

প্রান্তজন বলতে যে কোন ভাবে প্রান্তীয় অবস্থানে থাকা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জনজাতিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যারা সর্বদা কেন্দ্রের দিকে যাবার প্রয়াস করে। অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর প্রান্তের পরিচয় নির্ধারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "প্রান্ত নির্মিত হয় কেন্দ্রের সাপেক্ষে এবং পুরো ব্যাপারটাই অপেক্ষিক। কেন্দ্র হল সবচেয়ে আলোকিত, উজ্জ্বল একটি অবস্থান। যা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং সে মনোযোগ টানতে সমর্থ হয়। অপরপক্ষে, অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল, অনাকর্ষণীয় চরিত্র হলো প্রান্তের। সমাজে পড়ে থাকা প্রান্তিক মানুষেরা তাই মূলত নিম্নবর্গীয়, উচ্চ অভিজাত সমাজের কাছে ব্রাত্য, অন্ত্যজ, পতিত। তার বৃত্তিও তদ্রূপ। ক্ষমতা থেকে দূরে তার অবস্থান। ন্যূনশক্তি বলেই ক্ষমতাশালী

কেন্দ্র তাকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে। প্রান্তিক মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহায়, বিপন্ন, নিরন্ন, দরিদ্র, সুবিধাহীন, অপরিচিত, অনালোকিত। এরা ততটা আত্ম সচেতন নয়। এদের কণ্ঠস্বর মৃদু ও ভীরু।"[৭]

সামাজিক ক্ষমতায়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে সমাজে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়—

১: সমাজে ক্ষমতাবানের প্রভুত্ব—অধীনতা—ক্ষমতা লিপ্সার ফলে যে বৈষম্যের সৃষ্টি সেই বৈষম্য থেকেই প্রান্তজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ।

২: বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়ের বিভাজনের কারণে সমাজে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সমাজে শূদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, চণ্ডাল, দাস, অনার্য প্রান্তজন রূপে চিহ্নিত।

৩: সামাজিক বিভিন্ন বৈষম্য—নিপীড়ন—শোষণের কারণে সমাজে প্রান্তজনের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

৪: সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখা, সর্বগ্রাসী সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য মানুষ কেন্দ্র থেকে দূরে প্রান্তে অবস্থান করে।

৫: রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, মত পার্থক্যের কারণে বিরোধী পক্ষকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেওয়ার ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়।

৬: ধর্মীয় বিভেদ বৈষম্যের কারণে সমাজে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়।

৭: শিক্ষার তারতম্য, নিরক্ষরতা, শিক্ষাগত বৈষম্যে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়।

৮: ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়।

৯: মূলধারার উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংযোগ না থাকার জন্য কিংবা মানিয়ে নিতে না পারার জন্য মানুষ প্রান্তিক হয়ে পড়ে।

১০: শ্রেণি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জনজাতির ভাষাগত তারতম্যের কারণে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়।

১১: আধুনিক সময় বিবিধ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের কারণে কিছু সংখ্যক মানুষ প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছান।

১২: ভৌগোলিকভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে উদ্বাস্তু হওয়ার কারণে প্রান্তজনের সৃষ্টি হয়।

১৩: নারীর প্রতি চিরায়ত বিদ্বেষ-বৈষম্যের কারণে নারী ভারতীয় সমাজে প্রান্তজন রূপে চিহ্নিত।

বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় সমাজের মূল কেন্দ্রে বিভিন্ন মানুষ- গোষ্ঠী অবস্থান করলেও চিরস্থায়ী হতে পারেনি। কালের নিয়মে একজন অন্যকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বৈদিক যুগে আর্য, মধ্য ভারতীয় যুগে ব্রাহ্মণ, ঔপনিবেশিক যুগে শাসক ইংরেজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ- প্রভু এবং তাদের অধীনস্ত সামন্ত প্রভু, আঞ্চলিক প্রভু (জমিদার, জোতদার) সকলের সম্মিলিত অত্যাচারের লক্ষ্য- শূদ্র, চাষী, ক্ষেতমজুর, নিম্নবর্ণের মানুষ এবং অনার্য জনজাতি। আর্য থেকে ইংরেজ সকলেই সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষ কে বিভিন্ন কৌশলে মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। শোষক-শাসকের উপলব্ধি, বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না —

"সমাজে প্রান্তবর্গ ও প্রান্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এই বিচ্ছিন্নতার আধারে। সমাজে বিচ্ছিন্নতার রকম ফেরে ও মাত্রা ভেদে প্রান্তিক চেতনার স্বরূপ বদলে যায়। বদল ঘটে মূলস্রোতের সাথে প্রান্তবর্গের সম্পর্কের। তাই সমাজে প্রান্তবর্গের অবস্থান ও প্রান্তিকতার স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি, মাত্রা ও কারণের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুত প্রান্তিকতার প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বলতে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি- সংস্কৃতির মূলস্রোত থেকে জনজাতি,

সম্প্রদায়, কিংবা শ্রেণি বিশেষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রসঙ্গকে বোঝায়। বিচ্ছিন্নতা সামগ্রিকভাবে যেমন হতে পারে তেমনি তা সীমালঙ্ঘীও হতে পারে। সমাজের মূলস্রোতের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিশেষ শ্রেণি/সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বিশেষ যখন সামাজিক প্রক্রিয়া বিশেষ থেকে সর্বতোভাবে অসম্পৃক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে তখন তাকে সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা রূপে গণ্য করা হয়।"[৮]

সমাজের মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন প্রান্তজন বেঁচে থাকার তাগিদে গড়ে নেয় নিজেদের মতো জীবন-সমাজ পরিসর। সাধারণভাবে প্রান্তজন সেই জীবন-সমাজ পরিসরে কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণ করে টিকে থাকে।

প্রান্তজনের বৈশিষ্ট্য সমূহ—

১: প্রান্তজন সাধারণভাবে ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে বাস করেন। তবে কখনো কখনো মূলকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বা কেন্দ্রের নিকটবর্তী মানুষদের পাশাপাশি প্রান্তজন অবস্থান করেন।

২: প্রান্তজনের অধিকাংশই কৃষিজীবী, জমির সাথে সম্পৃক্ত চাষি। দিন মজুর, ঠিকা শ্রমিক, রাজমিস্ত্রীর কাজ সহ কায়িক শ্রমের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

৩: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র প্রান্তজন শিক্ষাগত ভাবে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণে সমাজের উচ্চপেশা, সম্মানীয় কাজে প্রান্তজনের উপস্থিতি নগণ্য ।

৪: প্রান্তজন পরম্পরা বাহিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করেন । অনেক সময় মূলস্রোতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে নিজেদের সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হন।

৫: সামাজিক ও মানসিকভাবে অনেক পিছিয়ে থাকায় প্রান্তজন হীনমন্যতা বোধের শিকার হন। যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন অপেক্ষা আবেগ ও সংস্কার নির্ভর জীবন কাটাতে পছন্দ করেন। আনুগত্য প্রদর্শন, প্রভুত্ব স্বীকার করে বেঁচে থাকেন।

৬: নারী-পুরুষ উভয়ে কঠিন কায়িক পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ করেন।

৭: কেন্দ্র থেকে প্রান্তে অবস্থানের কারণে নিজস্ব লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি, সংস্কার-বিশ্বাসের জগতে বিচরণ করেন।

৮: প্রান্তজন নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের জগতে বিচরণ করেন।

৯: কঠিন জীবন সংগ্রামে সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সর্বদা প্রয়াসী এবং প্রতি মুহূর্তে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেন।

১০: প্রেম-যৌনতার প্রকাশে প্রান্তজন অকপট। নেশা জাতীয় বস্তু নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেন।

১১: নিজস্ব ভাষা অর্থাৎ মুখের বুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

১২: রাজনীতির দাবাখেলায় প্রান্তজন ঘুঁটির মত ব্যবহৃত হন।

১৩: নারীর প্রতি অবমাননা প্রান্তজনের সমাজে যন্ত্রণার কারণ।

ভারতবর্ষে বৈদিক - আর্য সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণ বিভাজিত সমাজ। বর্ণ ও জাত প্রথার কারণেই ভারতীয় সমাজে প্রান্তজন ধারণার জন্ম। আর্যের প্রধান তিন বর্ণ - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নিজেদের 'দ্বিজ' পরিচয়ে তৃপ্তি পেতেন। অদ্বিজ ভাবনা থেকে সমাজের চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের আবির্ভাব।

ভারতীয় সমাজে শূদ্রের আবির্ভাব সম্পর্কে এস. সি. দুবের অভিমত—

"সম্ভবত, আর্য ও দাসজাতির সংমিশ্রণে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছিল। চাষবাসকেই তারা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের দ্বিজত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।"[৯]

ভারতীয় সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমাজে চারটি বর্ণের বাইরে আর একটি পৃথক শ্রেণি যাদের অ-বর্ণ বা পঞ্চম বর্ণ বলা হত। ঘৃণ্য জীবিকার কারণে পঞ্চম বর্ণ সেই অস্পৃশ্য মানুষগুলির সাথে দ্বিজের ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল নিষিদ্ধ। বর্ণ এবং বর্ণাশ্রমের কারণে বিভাজিত অস্পৃশ্য মানুষ প্রসঙ্গে নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—

> "বর্ণাশ্রমাশ্রিত সমাজ বিন্যাস এক হিসেবে যেমন ভারত ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমনি অন্যদিকে এমন সর্বব্যাপী এমন সর্বগ্রাসী এবং গভীর অর্থবহ সমাজ ব্যবস্থাও পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন বাংলার সমাজ বিন্যাসের কথা বলিতে গিয়া সেইজন্য বর্ণ বিন্যাসের কথা বলিতেই হয়।

বর্ণাশ্রম প্রথা অভ্যাসও যুক্তি পদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়- বৈশ্য- শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁধতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চর্তুবর্ণ প্রথা অলীক উপন্যাস এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষে এই চর্তুবর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর— উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এইসব বিচিত্র বর্ণ, জন ও কোমের স্তর - উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু – যাজ্ঞবল্কের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনো বিরাম হয় নাই।"[১০]

বর্ণ ও জাত ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত প্রয়াসে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রান্তজনের উৎপত্তি। ভারতের বিভিন্ন আদিম জনজাতিকে অনার্যরা নিজেদের স্বার্থে সমাজের অন্তর্ভুক্ত কড়লেও সমাজের প্রান্তসীমায় তাদের থাকতে বাধ্য করা হয়। সমাজভুক্ত অথচ সমাজের সীমায় অবস্থিত অনার্য প্রান্তজন হয়ে থেকেছে দিনের পর দিন। হিতেশ রঞ্জন সান্যালের অভিমত—

> "জাতি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে প্রধানত পর্বত ও অরণ্যবাসী দেশীয় উপজাতি সমূহের এবং চ্যালকোলিথিক বাসিন্দাদের সম্প্রসারণশীল হিন্দু সমাজে আত্মভূত করণের মাধ্যমে। রক্ষণশীল ধর্মশাস্ত্র অথবা পুরাণ অনুযায়ী জাতিগুলির উদ্ভব হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে। তারপর জাতির শ্রেণিবিভাগ ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছে ভিন্নবর্ণ এবং জাতির মধ্যে অথবা ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে বিবাহের ফলে। প্রসারণশীল আর্য ও দেশীয় অনার্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল অবশ্যম্ভাবী।"[১১]

আর্য - অনার্যের অবশ্যম্ভাবী যৌন সম্পর্কের ফলে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সংকর বর্ণের সৃষ্টি হয়। প্রতিলোমজ সন্তান আর্য ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেও সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত। ঘৃণিত প্রতিলোমজ সন্তান সমাজে ব্রাত্য প্রান্তজন রূপে চিহ্নিত।

ভারতীয় সমাজ সংগঠনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রকে সর্বপ্রকার গুণহীন, পশুবৎ প্রবৃত্তির অধিকারী রূপে দেগে দেওয়া হয় । আর্য সমাজ সংগঠনের প্রতিফলন আছে 'ঋগ্বেদ'- এ।

'ঋগ্বেদ' (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) দশম মন্ডলের পুরুষ-সূক্তে শূদ্র জন্মের ইতিহাস বর্ণিত —

> "যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
> মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যতে।।
> ব্রাহ্মমনোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
> উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজাত।।"

(ঋগ্বেদ সংহিতা — ১০/৯০/১১-১২)

— পরম পুরুষকে খন্ড খন্ড করা হল। ক' খন্ড করা হয়েছিল?

এর মুখ কি হল? দুই হস্ত, দুই উরু, দুই পদ কি হল?

> —এর মুখ হল ব্রাহ্মণ, দুই বাহু হল রাজন্য ক্ষত্রিয়, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দুই পা থেকে শূদ্র হল।"[১২]

'ঋগ্বেদে'র পুরুষ-সূক্ত একথা আমাদের জানায় শূদ্র অবজ্ঞার, ঘৃণার পাত্র। ফলত জন্ম উৎস থেকে শূদ্র প্রান্তজন। প্রান্তজনের সাথে ব্রাত্য শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ব্রাত্য অর্থে পতিত, ব্রতভ্রষ্ট মানুষদের বোঝান হত। ঘৃণা ও অবহেলা প্রাপ্য ছিল ব্রাত্যের। কায়িক শ্রমে অধিকারী শূদ্রের চিরকালীন দারিদ্র নিত্যসঙ্গী, অশিক্ষা তাদের বংশগত উত্তরাধিকার।

সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে প্রান্তজন ব্রাত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আর্য সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ একদিকে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে—

> "প্রাচীন বৈদিক ধারায় আর্যভাষীরা সমাজ রীতির দিক দিয়া দুই দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম এবং প্রধান দলকে বলিতে পারি "গ্রাম্য" অর্থাৎ গ্রামবাসী। ইহারা 'গ্রাম' লইয়া বাস করিত এবং সে গ্রাম গোড়ার দিকে যাযাবর ছিল। দ্বিতীয় দল যাহাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রাত্য'। পরবর্তীকালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ হওয়ার নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে 'ব্রতবাহ্য' অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়।"[১৩]

ভারতে বর্ণ প্রথা ও জাত ব্যবস্থায় ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্য একাধিপত্য। বিদ্যাশিক্ষার আলোকে আলোকিত ব্রাহ্মণ সুবিধা মতো সমাজ বিভাজিত করে নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছে। ধর্মীয় বাতাবরণে মোড়া বর্ণ ও জাত ব্যবস্থার সঙ্গে সুকৌশলে যুক্ত করেছে কর্মফল। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা 'প্রাচীন ভারতে শূদ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "বর্ণ প্রথার বিভিন্ন মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা ও সেইভাবে শূদ্রদের দাবিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যে শক্তিশালী কারণটি সাহায্য করেছিল তা হল কর্মফলবাদ ও সেই সঙ্গে দৈব নির্দিষ্ট বর্ণ বা জাতিগত কর্তব্য পালন না করলে তার অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে জনসাধারণকে ভজিয়ে রাখা।...
>
> শ্রমজীবী মানুষের মন ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের শৃঙ্খলে এমনই কঠোরভাবে বাঁধাছিল যে শূদ্রদের বিরুদ্ধে সরাসরি বল প্রয়োগ বা শূদ্রের পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিকদের শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে রাখা হয়েছিল। শূদ্ররা এসব সম্প্রদায়ে নির্বিবাদে যোগ দিতে পারতেন।

কোন না কোন পর্যায়ে শূদ্রদের নানা অংশের আশা - আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়েছিল বিভিন্ন ধর্ম সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী। শূদ্র হস্ত শিল্পীদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় আর শূদ্র কৃষকদের ক্ষেত্রে ঐ একই ভূমিকা পালন করেছিল শৈব বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্ম গোষ্ঠী গুলি। কিন্তু কোনো ধর্মগোষ্ঠীই চতুর্থ বর্ণের দাস সুলভ অবস্থায় সারগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বা বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কারবাদী আন্দোলনের কোনটিই প্রশ্ন তোলেনি 'কর্ম'র মূলতত্ত্ব নিয়ে, যে মতবাদ যোগান দিয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাসের তাত্ত্বিক ভিত্তি। সামাজিক বিক্ষোভকে বৈপ্লবিক দিকে প্রবাহিত করার পরিবর্তে ধর্মীয় সাম্যের আশ্বাস দিয়ে নিম্নবর্গকে তারা প্রচলিত সামাজিক প্রথার সঙ্গে আপোসে আসতে সাহায্য করেছিল, সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনাই ছিল এইসব আন্দোলনের গোড়ার দিকের লক্ষণ। কিন্তু কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বর্ণ সংগঠনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তারা নিজেদের এক

করে তোলে। অতএব এইসব উপাদান কারণের সমাহার শূদ্রদের তুলনায় শান্তভাব রক্ষা করতে ও তাদের চিরস্থায়ী দাসত্বকেই সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।"[১৪]

ধর্মের দোহাই পেড়ে মনু শূদ্র সহ সমস্ত প্রান্তজনকে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের মায়াজালে জুড়ে চিরস্থায়ী দাসত্বের পথ প্রশস্ত করে গেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন—

> "শূদ্রের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র থেকে ধর্ম শাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলেছে যে, তার স্থান অন্য তিন বর্ণের নিচে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বতভাবে এদের সেবা করা। পরবর্তীকালে জন্মান্তর বাদ ও কর্মবাদের দ্বারা এই মতকে দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে, পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্রের শূদ্রজন্ম, এবং এজন্মে যথোপযুক্তভাবে দ্বিজ সেবা করলে পরজন্মে সে উচ্চতর বর্ণে জন্মাবে; এ জন্মে দ্বিজসেবায় ত্রুটি ঘটলে সে আরও হীন পশুযোনি প্রাপ্ত হবে।"[১৫]

হিন্দু ভাবধারার দেশ ভারতে ইসলাম ধর্ম ও ভাব অপেক্ষাকৃত নবীন। ইসলাম ধর্ম অনুসরণকারীদের বাদ দিলে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রভাব ভারতীয় সমাজের প্রায় সর্বত্রই । পুরাণ, সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমোঘ প্রভাবের কথা লিখিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পাপ - পুণ্যের অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর তৈরি করে অধিকাংশ মানুষকে প্রান্তিক করে রেখেছে যুগের পর যুগ।

> "সর্বকালের সর্বদেশের সমাজেই স্তরভেদ আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ণ ও জাতিভিত্তিক স্তরভেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে একটি অপবিত্রতার ধারণা ও তদভিত্তিক আচরণ পদ্ধতি - যা একান্তই ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অংশীভূত। ছুৎমার্গের কথা বলছি। কোন কোন স্তরের মানুষকে স্পর্শ করলে বা তার স্পর্শ করা খাদ্য গ্রহণ করলে পতিত হতে হয় — অপবিত্রতার এই ধারণা। এই ধারণার সঙ্গে কর্মফলবাদ ও পুনঃজন্মের যান্ত্রিক ধারণাগুলি যুক্ত হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে এক তাত্ত্বিক ভিত্তি দান করে কেবলমাত্র তাকে অমোঘ অপরিবর্তনীয় রূপে প্রতিভাসিত করে মানবতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক ধারার উন্মেষকে অসম্ভব করে তুলেছে।"[১৬]

বেদের যুগ থেকে আজকের সময় পর্যন্ত এই ধারাই অনুসৃত হয়ে চলেছে। ফলে সমাজে প্রান্তজনের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমশ।

প্রান্তজনের সংখ্যাবৃদ্ধির পশ্চাতে অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের বাসনায় আজকের দিনে সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সৃষ্টি—

> "বর্ণের দিক থেকে পৃথক উচ্চাসনে বসে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগপর্বে এক শ্রেণির মানুষ যেমন ক্রমাগত সেবা শ্রদ্ধা এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে করতে কর্তৃত্বের সর্বোচ্চস্তর উপভোগ করেছে, অন্যদিকে তেমনি অত্যাচার অবমাননার মধ্য দিয়ে দেশের বৃহদংশের মানুষই উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোকদের সমর্থন পুষ্ট দেশজ সংস্কৃতির সমবায় প্রতীতি থেকে ক্রমবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সমবায় প্রতীতি ছাড়া কোন সমাজের মধ্যে কাঙ্খিত ভারসাম্য তৈরি হয় না। কারণ সমবায় প্রতীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষ বুঝতে পারে যে সমগ্র জগৎ সংসারই একটা মহাপরিবার আর সেই মহাপরিবারের বিস্তীর্ণ ও অভেদে প্রত্যেক মানুষই আসলে মহাপরিবারের এক একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এই মহাপারিবারিক আলেখ্য সমমর্যাদা থেকে বিচ্যুতিই কিন্তু বারবার এক শ্রেণির মানুষকে প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গ হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে এই ভেদ প্রবণতাকে চালনা করেছে বর্ণ, ঔপনিবেশিক যুগে এই ভেদ প্রবণতাকে সমর্থন করেছে শিক্ষা আর আজকের এই ঔপনিবেশিক কালখন্ডে ভেদ

> প্রবণতার তাত্ত্বিক ভাষ্য তৈরি করেছে প্রতারক অর্থনীতি। সুতরাং সমবায় প্রতীতির ভাঙন প্রথমে বর্ণগত, তারপর ক্রমান্বয়ে কখনো তা শিক্ষাগত আবার কখনো তা অর্থগত। এবং এভাবেই আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির কাছে পরাভূত হয়েছে নিম্নবর্গ জনের স্বর ও স্বীকৃতি। মানুষে হয়েও তারা পায়নি যুগবাহিত আলোকপ্রাপ্ত প্রতিবেদন।"[১৭]

সমাজে নিম্নবর্গের অবস্থান উচ্চবর্গের বিপরীতে। কিন্তু প্রান্তবর্গের অবস্থান উচ্চবর্গ পরিচালিত সমাজ - সংস্কৃতি - অর্থনীতি - রাজনীতির মূলস্রোতের বিপরীতে। সমাজ যাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে সব আলো। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালে ২০সেপ্টেম্বর রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন —

> "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে — উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে – জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে — উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"[১৮]

প্রান্তজন মাথায় প্রদীপ নিয়ে শতাব্দীর শতাব্দী দাঁড়িয়ে থাকলেও অন্ধকারেই তাদের বাস। সমাজের প্রান্তে বাস করতে করতে একসময় নিজেদের পৃথক জীবন - সংস্কৃতির অধিকারী মানুষ যারা মূল স্রোতের সাথে মিশে যাবার প্রয়াসী হয়েও স্বতন্ত্র জীবন অতিবাহিত করে চলেছে।

ভারতীয় সমাজ পর্যালোচনা এবং ইতিহাস বিচার করে জাতিগত ও বৃত্তিগত প্রান্তজন হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি—

> মুচি, মাল, মেথর, ডোম, রুই, লোহা, কামার, সাঁওতাল, লোধ, কোটাল, শবর, বাগদি, চৌদুলি, বাগ, বেদে, কুমোর, তাঁতি, মালাকার, দাস, হাড়ি, কলু, বুনো, মাঝি, পোদ, বাউরি, দুলে, নাপিত, প্রামাণিক, কাহার, বাজিকর, চণ্ডাল, কাপালিক, চাষি, ওঁরাও, মুণ্ডা, দোসাদ, ধোবি, চামার, গুঞ্জ সদাই, ধনুক, অঘোর, কাপালি, বাঞ্জারা, বরো, ধোবা, ঢেকারু ধেনুয়ার, ধুনিয়া, কইরা, তৈলি, খেড়িয়া, কোল, কুকি, কুর্মি, মাহাতো, গাঙ্গোঁতা, মালি, শিয়াল, তিলি, শাঁখারী, ডোম, ডোরাং, বেদিয়া, বেদে, বাদ্যা, মুন্ডা, ঘাসি, তুরি, নাগর, কুর্মী, ঝাড়ুদার, জমাদার, নমশূদ্র, চণ্ডাল, চাঁড়াল, সাঁওতাল, মালপাহারিয়া, মাহালি, কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, মুসাহর, ভুঁইমালী, মাদুয়া, মালো, কৈবর্ত, ধীরব, প্রভৃতি জাতি ও সমাজের মানুষ প্রান্তজন।

আধুনিক সময়ে বর্ণ, জাত বিভাজনের সীমায় প্রান্তজনের সংখ্যা স্থির থাকেনি। সমাজে প্রান্তজনের বিষয়টি আপেক্ষিক। আজকের দিনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ভাবে বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া মানুষও প্রান্তজন রূপে বিচার্য হতে পারেন । স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় বর্ণ ও জাত বিভাজনের পাশাপাশি সমাজ সভ্যতার বিবর্তনে কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন মানুষই প্রান্তজন। মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়া এক বড় অংশের মানুষ প্রান্তজন হিসেবে বিচার্য হন । সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনে প্রান্তজনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রাচীন ভারতীয় বর্ণ ও জাত ব্যবস্থার ধারায় সৃজিত প্রান্তজনের পাশাপাশি আধুনিক সময়ে জীবিকা অর্জনের কারণে কিছু প্রান্তজনের দেখা মেলে।

জীবিকা অর্জনের কারণে সৃজিত প্রান্তজন —

হকার, ভিখারী, কুলি, গৃহভৃত্য, পরিচারিকা, ঝি, চাকর, ঝাড়ুদার, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, গণিকা, গাড়ির ড্রাইভার, হেল্পার, কন্ডাক্টর ।

বাসস্থানের দিক থেকে বস্তিবাসী, ফুটপাতবাসী মানুষ প্রান্তজন। পাগল, ভবঘুরে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ প্রান্তজন। দেশভাগের কারণে ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষজন অধিকাংশই সামাজিকভাবে প্রান্তজন রূপে বিচার্য হন।

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক সময়ে নারীকে প্রান্তজন হিসেবে চিহ্নিত করা করা হয় ।

তথ্যসূত্রঃ

১) Johnston Ruth, 'The Conceptof the 'Marginal Man, A New Approach' First published: January1965. https://doi-org/10.1111/j.1468-2435,1965.tb00729.x

২) চট্টোপাধ্যায় সনৎকুমার (প্রকাশক), আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ আগস্ট ২০০০, পৃষ্ঠা ৫৪৪।

৩) তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৬।

৪) মুখোপাধ্যায় অপূর্ব, 'পশ্চিম বাংলার গ্রামোন্নয়ন চর্চা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান', রায় শমীক (সম্পাদক), ভোরাই পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৪৭।

৫) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭

৬) রায় শমীক (সম্পাদক), 'প্রান্তিকতার সহজ পাঠ', ভোরাই পত্রিকা, ২য় বর্ষ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৮।

৭) নস্কর সনৎকুমার, পুরাতনী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড), আশাপূর্ণা প্রকাশনী ৭২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০২২, পৃষ্ঠা ২৮১।

৮) রায় শমীক (সম্পাদক), প্রান্তিকতার সহজ পাঠ, ভোরাই পত্রিকা, ২য় বর্ষ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ১১।

৯) দুবে এস. সি. ভারতীয় সমাজ, অনুবাদ রজত রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, বসন্তকুঞ্জ, ফেস-II, নয়াদিল্লী-১১০০৭০, প্রথম প্রকাশ ১৯১৬, অষ্টম মুদ্রণ ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫।

১০) রায় নীহার রঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: বৈশাখ ১৪০০, পঞ্চদশ সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃষ্ঠা ২৯৩।

১১) সান্যাল হিতেশ রঞ্জন, 'বাংলায় জাতির উৎপত্তি', বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর ও দাশগুপ্ত অভিজিৎ(সম্পাদিত), জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, প্রকাশক আই সি বি এস, দিল্লীর পক্ষে পার্থ শঙ্কর বসু কর্তৃক নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২২।

১২) হোসেন সোহারাব, বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০০৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫।

১৩) সেন সুকুমার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৭৩, সপ্তম মুদ্রণ: জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা ১০।

১৪) শর্মা রাম শরণ 'প্রাচীন ভারতে শূদ্র', কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৫।

১৫) ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, (ভাষান্তর বিজয়া গোস্বামী, নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত, করুণাসিন্ধু দাস,) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৬, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ১৮৪।

১৬) রুদ্র অশোক, ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন পিপলস বুক সোসাইটি; ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা ১২।

১৭) সেন মজুমদার জহর, 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা ১২।

১৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ।

লেখক পরিচিতি:

ডঃ রজত কিশোর দে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং সুব্রত মণ্ডল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণারত।